Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501041 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The Five Luminaries of Nineteenth-Century Nationalism in Music
সংগীতে স্বাদেশিকতায় উনবিংশ শতকের পঞ্চপ্রদীপ

Madhuchhanda Manna
Assistant Professor
Music Department
Women's College, Kolkata

Received on: 21st April 2026
Accepted on: 08th May 2026

Abstract:
The nineteenth century played a crucial role in the history of India's freedom movement. From the latter half of this century, the awakening of national political consciousness became evident in Bangladesh, and it was during this time that the desire for independence began to grow among the people. Due to the severe oppression of British colonial rule, common people gradually developed resentment against the British, which eventually took the form of a national movement and led to open resistance.

The first pioneer of this Indian renaissance was Raja Rammohan Roy. Along with him, several eminent personalities contributed significantly to this awakening, including Ishwar Chandra Vidyasagar, Michael Madhusudan Dutt, Swami Vivekananda, Rajshekhar Basu, and Debendranath Tagore. This article briefly discusses how these great figures brought about the renaissance in India.

Furthermore, during the surge of the Swadeshi movement, five young poets and lyricists actively participated through their literary and musical talents. These five poets are Rabindranath Tagore, Dwijendralal Roy, Rajanikanta Sen, Atulprasad Sen, and Kazi Nazrul Islam. Although not all were born strictly within the nineteenth century, they are often regarded together as the "Pancha-Pradeep" (Five Luminaries) of modern Bengali literature. Their poetic genius brought a wave of transformation in Bengali literary society.

The Swadeshi songs composed by these poets played a vital role in inspiring nationalist sentiments among the people. Since music is a universal language, this paper primarily explores how the compositions of these five poets contributed to shaping and energizing the Swadeshi movement.

Key Words:
Renaissance and Nationalism, Tagore Family and National Consciousness, Rabindranath Tagore, Dwijendralal Roy, Rajanikanta Sen, Atulprasad Sen, Kazi Nazrul Islam.

মূল প্রবন্ধ

ঊনবিংশ শতকে স্বাদেশিকতার নবজাগরণ:

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারে সাধারণ ভারতবাসীর মনে বিদ্রোহের আগুন ধীরে ধীরে জ্বলে উঠেছিল। ইংরেজদের শাসন আর শোষণ ভারতবর্ষের মানুষের জীবন এবং জীবিকাতে আঘাত করেছিল। তাই ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে ভারতবর্ষে স্বদেশিকতার আকাঙ্খা আরো তীব্র হতে শুরু করেছিল। ভারতবর্ষের মানুষকে ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার করতে বাধ্য করানো, ভারতবর্ষের নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে ব্রিটিশ রাজত্ব কায়েম করে এদেশে সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনা, এই সমস্ত কারণে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মধ্যে এক প্রতিবাদী ঐক্য গড়ে উঠতে থাকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। সমাজের শিক্ষিত মহলের মধ্যেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতীয়তার উন্মেষ দেখা গিয়েছিল। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ এবং ১৮৬০ সালের নীল বিদ্রোহ সাধারণ ভারতবাসীর মনে এক জাতীয়চেতনার জাগরণ ঘটেছিল যা পরবর্তীকালে এক বিরাট জাতীয় আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। তৎকালীন ভারতবর্ষের এই জাতীয় আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন কয়েকজন যুগপুরুষ যেমন রাজা রামমোহন রায়, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঊনবিংশ শতকের পঞ্চপ্রদীপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন এবং কাজী নজরুল ইসলাম।

ভারতবর্ষে এই নবজাগরণ কথাটি প্রথম উদ্ভব হয়েছিল এই ব্রিটিশ শাসনের ফলেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই নবজাগরণের প্রথম প্রবক্তা হলেন রাজা রামমোহন রায়। মোহিতলাল মজুমদারের ভাষায় — “রামমোহন সকল বিষয়ে বাস্তব প্রয়োজন ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়া, সমাজ-শাসন বা শাস্ত্রবিধি অমান্য করিবার পন্থা নির্দেশ করিলেন; রামমোহনই সর্বপ্রথম এই মৃত-কল্প জাতির ঘোর তামসিকতাকে সাত্বিকতার ভানমুক্ত করিয়া একটা রাজসিক আদর্শের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন।... অতি সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবাদের সন্নাস-বৈরাগ্য ও সর্বপ্রকার গুহ্যসাধনা হইতে জাতির মনকে মুক্ত করা; যাহা একটা অন্ধবিশ্বাস মাত্রে পর্যবসিত হইয়া জীবনকে কুণ্ঠিত ও ভয়গ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল এবং চারিত্রিক দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিতেছিল — তাহার উচ্ছেদ-সাধন।... ইহাই সেযুগের প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা।”[১]

বস্তুত রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ঊনবিংশ শতকের আধুনিক বাংলা ভারতের জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রথম ধারক ও বাহক। ঊনবিংশ শতকে আর একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজে নারী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের প্রচলন করে ভারতবর্ষের মানুষের মনে সমাজের অন্ধবিশ্বাসের অচলায়তনে আঘাত হেনেছিল। বাংলা সাহিত্যের জগতে বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্যের বিকাশ, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনা এবং সমাজ সংস্কার-মূলক রচনা ঊনবিংশ শতকের যুগে এক নতুন সমাজচিন্তার সূচনা করেছিল। এর পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে স্বদেশি আন্দলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণ বসু ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ‘স্বজাতীয়ভাব ও স্বদেশানুরাগ-সঞ্চারিণী সভা’ নামে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে একটি ক্ষুদ্র ইংরেজি অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে আর একজন প্রখ্যাত বাঙালির কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে নবভারত সূচনার ইতিহাসে, তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল মুর্খ, দরিদ্র, সমাজের অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন — “আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, ... ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না।”[২] এই প্রসঙ্গে স্বামীজী আরো বলেছেন — “জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগিকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজসংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না — ক্ষতটি কোথায়। বিধবা-বিবাহের প্রচলন দ্বারা তাঁহারা জাতিকে উদ্ধার করিতে চাহেন। আপনি কি মনে করেন যে, বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপর কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে?... সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি — যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে।”[৩]

© Santiniketan Sahityapath

স্বামীজী প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন নি ঠিকই কিন্তু সমাজের অবহেলিত মানুষের জন্য তাঁর ভাবাদর্শ এদেশের যুবকদের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ভারতবর্ষে নবজাগরণের আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করবার জন্য স্বামীজী আন্দোলনরত কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন — "তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ — কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাসনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ — অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগন আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এইসকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনার নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে — তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমনকি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে — স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।"[৪] ধর্মকে কেন্দ্র করেই এদেশে নবজাগরণের আন্দোলন প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। উনিশ শতকে ভারতবর্ষের নবজাগরণের মুক্তি আন্দোলনের মূলে ছিল সমাজের নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, গোষ্ঠী। এরপরে ইংরেজ শাসকদের বুঝতে দেরি হলো না যে, ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ বেড়ে উঠছে। ভারতবর্ষের স্বদেশি আন্দোলন এইভাবে ঊনবিংশ শতকের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা বিশাল আকার ধারণ করেছিল।

স্বদেশচেতনায় ঠাকুরবাড়ি:

ঊনবিংশ শতকে নবজাগরণের প্রকৃত জনক রাজা রামোহন রায়ের সঙ্গে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন বাঙালি যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ঠাকুর পরিবারের দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম অন্যতম। এই ঠাকুর পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল হিন্দুমেলার আয়োজন করা হয়। দেশের সর্বস্তরের মানুষকে হিন্দুমেলার প্রাঙ্গনে একত্রিত করবার প্রচেষ্টা, এ এক অভূতপূর্ব এবং নজিরবিহীন ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে। এই হিন্দুমেলাই সমাজের বুদ্ধিজীবী মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বদেশিকতার অনুভূতি জাগিয়েছিল একথা অনেকেই স্বীকার করেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখদের আর্থিক সাহচর্যে এবং রাজনারায়ণ বসুর অনুপ্রেরণায় এই হিন্দুমেলা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই মেলার উদ্দেশই ছিল নিজের দেশের শিল্পের উন্নতিসাধন, সাহিত্যের বিকাশ, সংগীতের চর্চা ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে হিন্দুমেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথের উক্তিতে — "ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্যের আমরা রাজপুরুষের সাহায্য যাচঞা করি, ইহা সাধারণের লজ্জার বিষয়।... অতএব যাহাতে আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয় তাহা এই মেলার উদ্দেশ্য।"[৫] এই হিন্দুমেলা যখন স্থাপিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। সুতরাং অতি বাল্যকাল থেকেই হিন্দুমেলার উচ্ছ্বাস বালক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে বালক রবীন্দ্রনাথ প্রথম সবার সামনে দাঁড়িয়ে 'হিন্দুমেলার উপহার' শীর্ষক স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। এই কবিতাটি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম স্বনামে রচিত কবিতা। এই হিন্দুমেলাই ভারতের জাতীয় জীবনকে এমনভাবে প্রেরণা দিয়েছিল যে তখনকার দিনে বাঙালি সমাজ স্বদেশের উন্নতি সাধনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং এর ফলেই জন্ম নিয়েছিল জাতীয় সংগীত বা স্বদেশি সংগীত।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বকালে দেশের মানুষের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত করানোর জন্য এক নতুন ধরণের সংগীত সৃষ্টি করা হয়, সেই সংগীতের নাম স্বদেশি সংগীত বা জাতীয় সংগীত। এই সংগীতের প্রধান ভাষা হলো স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, জনকল্যাণ, কোনো মহৎ কর্মের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার আহ্বান, পরাধীন ভারতকে ব্রিটিশদের কবল থেকে উদ্ধার করা। এর আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বদেশি সংগীত বা দেশাত্মবোধোক সংগীতের কোনো ঐতিহ্য ছিল বলে মনে হয় না। ভারতবর্ষে যখন মুসলিমদের রাজত্ব চলেছিল তখনো ভারতবাসী নিজেদেরকে এতটা পরাধীন ভাবেনি যতটা ইংরেজ রাজত্বকালে অনুভব করেছে। তার কারণ ইংরেজ শাসনের অত্যাচারটাই ছিল অন্যরকম।

এই প্রসঙ্গে দেশপ্রেমিক শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর বলেছিলেন — "মুসলমান আমলে ভারতবাসী পরতন্ত্র হইলেও এরূপ পরাধীন ছিল না। ইংরাজের আমল হইতেই ভারতে প্রকৃত পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার সূত্রপাত হইয়াছে। এই পরাধীনতা ও পরতন্ত্রতার

© Santiniketan Sahityapath

বিষময় ফলে দেশের লোকের আর পূর্বেকার ন্যায় সংকল্পে দৃঢ়তা নাই, কার্যে উৎসাহ নাই, জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য নাই-দেশের জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ দেশের ও সমাজের এই দুরবস্থা দর্শনে হৃদয়ের ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছেন, নানা সংগীত ও কবিতার আকারে তাহা প্রকাশিত হইতেছে। ইহাই বর্তমান কালের স্বদেশ ভক্তিমূলক সংগীতগুলির উৎপত্তির কারন।"[৬]যে কোনো সামাজিক বিষয়কে উপলক্ষ্য করে কবিরা সংগীত লিখেছেন যেমন, দীর্ঘদিনের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার বেদনা সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে আবার কোনো কবি মাতৃভূমির রূপের বর্ণনা করে মাতৃভূমির প্রতি প্রেম জাগ্রত করার চেষ্ঠা করেছেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দেমাতরম্' গানটি দেশমাতৃকার বর্ণনামূলক সংগীত। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনেক স্বদেশি গান রচিত হয়েছে, যেমন, "দেবেন্দ্রনাথ সেনের — 'হিন্দু মুসলমান হয়ে এক প্রাণ এস পুজি মা'য়ের চরণ', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চরকার গান', হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়', মাইকেলের 'পুনঃ কি হরযে শুক্লতে ভারতশশী ভাতিবে সংসারে', গোবিন্দ রায়ের 'কতকাল পরে ভারত রে দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবি', নবীনচন্দ্র সেনের 'এ নহে আর্যাবর্ত, আমারাও নহি সেই আর্যের কুমার', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'জাগিল ভারত দুঃখিনী জননী', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান', বীরবলের 'মম বঙ্গাভূমি শ্যামাঙ্গিনী' প্রভৃতি গান উল্লেখযোগ্য।"[৭] শুধু বাংলা ভাষায় নয়, ভারতের সব ভাষাতেই এই স্বদেশি সংগীত রচিত হয়েছে। তবে ঊনবিংশ শতকে বাঙালীদের মনে স্বদেশচেতনা সবথেকে বেশি জাগ্রত হয়েছিল স্বদেশি সংগীতের মাধ্যমে। দেশের মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করার জন্য সবথেকে বেশি জনপ্রিয় স্বদেশি সংগীত রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এরপরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন এবং নজরুল ইসলাম প্রমুখ কবি, সাহিত্যিকের রচিত স্বদেশি সংগীত দেশের মানুষকে প্রভাবিত করেছে বহুল পরিমাণে। তাই এই পাঁচজন কবিকে সংগীত জগতে ঊনবিংশ শতকের পঞ্চপ্রদীপ বলা হয়। এই পাঁচজন কবি-সাহিত্যিকের হাত ধরে বাংলা আধুনিক যুগের অনেক পরিবর্তন দেখা গিয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম প্রদীপ:

ঊনবিংশ শতকের পঞ্চপ্রদীপের প্রথম প্রদীপ হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্য ও সংগীত জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন এক প্রতিভাধর স্বর্ণোজ্জ্বল প্রদীপের শিখা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের মূল মন্ত্র ছিল প্রগতিবাদ। ঊনবিংশ শতকে ভারতবর্ষে স্বাদেশিকতার মরা গাঙে বান ডেকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশি সংগীতের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশ প্রীতি পারিবারিক সূত্র থেকেই অর্জিত। স্বদেশিকতায় ঠাকুর পরিবারের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর জীবনস্মৃতিতে বলেছেন — "বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটি স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।"[৮] হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনী সভা, স্বদেশিকতার সভা ঠাকুরবাড়ির এই সমস্ত স্বদেশিক কাজকর্মের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ অতি বাল্যকাল থেকেই স্বদেশি কবিতা ও স্বদেশি সংগীত রচনা করেছিলেন। বাল্য বয়সে কবির স্বদেশের প্রতি নব-চেতনা প্রসঙ্গে কবি তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন — 'বাংলাভাষাটাকে তখন শিক্ষিত সমাজ অন্দরে মেয়ে-মহলে ঠেলে রেখেছিলেন; সদরে ব্যবহার হত ইংরেজি — চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায়, এমন কি মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারেনি। সেখানে বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই, "আমাদের বাড়ীতে আরেকটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্-পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গো এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালে প্রায় প্রতিদিনে বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোকে। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশের ধর্ম সাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়ীতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত, "এই যেমন একদিকে তেমনি অন্যদিকে আবার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ীর হাওয়া শেক্সপীয়রের নাট্যরস-সম্ভোগ আন্দোলিত, স্যার ওয়ালটার স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশপ্রীতির উন্মাদনা তখন কোথাও নেই।

© Santiniketan Sahityapath

রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' আর তারপরে হেমচন্দ্রের 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' কবিতায় দেশমুক্তি কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মত শোনা যায়। 'হিন্দুমেলা'র পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ীর সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা 'জয় ভারতের জয়' গণদাদার লেখা 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কী করে', বড়দাদার 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'। জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়ীতে তার অধিবেশন; ঋকবেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান; রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।"[৯]

এরপরেই কবি স্বদেশের জন্য কবিতা, গান রচনা করতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের স্বদেশি আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। এই আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে একটি মর্মান্তিক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগটাকেই মোটামুটিভাবে স্বদেশি আন্দোলনের যুগ বলে মনে করা হয়। ১৯০৫ সালের এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পুরোপুরি সামিল করে ফেলেছিলেন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সেই বিখ্যাত গান — 'আমার সোনার বাংলা / আমি তোমায় ভালোবাসি।' এই গানটি ১৯০৫ সালের ৭ অগস্ট কলকাতার টাউন হলের এক প্রতিবাদী অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়েছিল। ধীরে ধীরে এই গান সারা শহরবাসীকে উন্মাদনায় ও অনুপ্রেরণায় মাতিয়ে তুলেছিল। এরপর ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জনের দ্বারা বাংলার বিভাজন আইন যখন বাস্তবায়িত হলো তখন ওই দিনটিকে কালাদিবস হিসেবে পালন করা হলো এবং ওই দিনেই রবীন্দ্রনাথ 'রাখীবন্ধন' উৎসব উদযাপন করলেন। এই দিন উপলক্ষে তিনি রচনা করলেন — 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল / পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান'। রবীন্দ্রনাথ রচিত এই সংগীত শুনে দেশের অনেক তরুণ যুবকবৃন্দ স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল। এরপরেই কবির কলম থেকে রচিত হলো একের পর এক স্বদেশি গান।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সংগীতের কথা আলোচনা করতে গেলে 'গীতবিতান' গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। 'গীতবিতান'এর প্রথম খণ্ডে ও তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের সংগীতের উল্লেখ আছে। প্রথম খণ্ডে আছে ৪৬টি গান আর তৃতীয় খণ্ডে আছে ১৬টি গান। এই সমস্ত গান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ সংগীত জীবনের দ্বিতীয় পর্বে স্বদেশি গানগুলি রচিত হয়েছে। ১৯০০-১৯১৫ সাল পর্যন্ত পর্বটিকে রবীন্দ্রনাথের সংগীত জীবনের দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলিকে সবদিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে রচনাকাল অনুযায়ী স্বদেশি গানগুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ভাগগুলি হলো —

- বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে রচিত স্বদেশি সংগীত
- বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে রচিত স্বদেশি সংগীত
- বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে রচিত স্বদেশি সংগীত

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে রচিত স্বদেশি সংগীত:

এই পর্বে রচিত সংগীতগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক গান হয়তো রবীন্দ্রনাথের সংগীত জীবনের দ্বিতীয় পর্বের আগে রচিত। কবির এই পর্বে রচিত স্বদেশি গানের সংখ্যা ২১টি। গানগুলি হলো —

গানের তালিকা	রচনাকাল	বয়স
১। 'তোমারি তরে, মা সঁপিনু এ দেহ'	১২৮৪ (১৮৭৭)	১৬
২। 'ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা, জলদে'	১২৮৫ (১৮৭৮)	১৭
৩। 'অয়ি বিষাদিনী বিনা'	১২৮৫ (১৮৭৮)	১৭
৪। 'ভারত রে, তোর কলঙ্কিত'	১২৮৫ (১৮৭৮)	১৭

© Santiniketan Sahityapath

৫। ‘এক সূত্রে বাঁধিয়াছি’	১২৮৬ (১৮৭৯)	১৮
৬। ‘দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান’	১২৮৯ (১৮৮২)	২১
৭। ‘শোনো শোনো আমাদের ব্যাথা’	১২৯১ (১৮৮৪)	২৩
৮। ‘একি অন্ধকার এ ভারত ভূমি’	১২৯১ (১৮৮৫)	২৩
৯। ‘তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ’	১২৯৪ (১৮৮৭)	২৬
১০। ‘কেন চেয়ে আছ গো মা’	১২৯৩ (১৮৮৬)	২৫
১১। ‘একবার তোরা মা বলিয়া ডাক	১২৯২ (১৮৮৬)	২৪
১২। ‘কে এসে যায় ফিরে ফিরে’	১৩০৪ (১৮৯৭)	৩৬
১৩। ‘হে ভারত, আজি তোমারি’	১৩১৬ (১৯০৯)	৪৮
১৪। ‘নব বৎসরে করিলাম পণ লব’	১৩০০৮ (১৯০৯)	৪০
১৫। ‘আমরা মিলেছি আজ’	১২৯৩ (১৮৮৭)	২৫
১৬। ‘আগে চল্, আগে চল ভাই’	১২৯৩ (১৮৮৭)	২৬
১৭। ‘আমায় বোলো না গাহিতে’	১২৯৩ (১৮৮৬)	২৫
১৮। ‘অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা’	১৩০৩ (১৮৯৬)	৩৫
১৯। ‘জননীর দ্বারে আজি ওই’	১৩১০ (১৯০৩)	৪২
২০। ‘আজি এ ভারত লজ্জিত হে’	১৩০৬ (১৮৯৯)	৩৮
২১। ‘আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে’	১২৯৯ (১৮৯৩)	৩১

বঙ্গাভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে রচিত প্রায় সবকটি গানই রাগ-ভিত্তিক। তবে কিছু গান যেমন, ‘আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে’, ‘একবার তোরা মা বলিয়া ডাক’, এই গানগুলি রামপ্রসাদী সুরের প্রভাবে রচিত। ‘আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে’ গানটি জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন (১৮৮৬) উপলক্ষে রচনা করা হয়েছিল বলে জানা যায়। এই সভাতে এই গানটি উদ্বোধনী সংগীত রূপে গাওয়া হয়েছিল। এই সময় রচিত বাকি সব কয়টি গানে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বঙ্গাভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে রচিত স্বদেশি সংগীত:

এই সময় কবি প্রায় ২৪টি স্বদেশি সংগীত রচনা করেছিলেন। কবির এর আগের সময়ে রচিত গানগুলিতে কেমন হতাশা, নৈরাশ্য, বেদনা, বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে। তাই গানগুলি যেন গম্ভীর প্রকৃতির গান। কিন্তু বঙ্গাভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে রচিত গানগুলি প্রচলিত সুরেই বেশি রচিত হয়েছে। এই বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। কবির এই সময় রচিত গানগুলি হলো —

গানের তালিকা	রচনাকাল	বয়স	সুরের প্রভাব

© Santiniketan Sahityapath

১। ‘আমার সোনার বাংলা’	১৩২২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল
২। ‘ও আমার দেশের মাটি’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল
৩। ‘যদি তোর ডাক শুনে’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল
৪। তোর আপন জনে ছাড়বে’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল
৫। ‘এবার তোর মরা গাঙে’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	সারি গান
৬। ‘নিশিদিন ভরসা রাখিস’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল
৭। ‘আমি ভয় করব না’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল
৮। ‘আপনি অবশ হলি’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল গান
৯। ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	ঢপ্ কীর্তন
১০। ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয়’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	মিশ্র লৌকিক
১১। ‘সার্থক জনম আমার’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল
১২। ‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল
১৩। যে তোরে পাগল বলে’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল
১৪। ‘তোরা নেই বা কথা’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল
১৫। ‘যদি তোর ভাবনা থাকে’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল
১৬। ‘মা কি তুই পরের দ্বারে’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল
১৭। ‘ছি ছি চোখের জলে’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	লৌকিক কীর্তন
১৮। বুক বেঁধে তুই দাঁড়া’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল
১৯। ‘আমারা পথে পথে যাব’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল
২০। ‘ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বেহাগ বাউল
২১। ‘বিধির বাঁধন কাটবে তুমি’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	বাউল সুর
২২। ‘খ্যাপা তুই আছিস’	১২৯৯ (১৮৯২)	৩১	বাউল সুর
২৩। ‘ওরে ভাই, মিথ্যা’	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪	ভৈরবী রাগ
২৪। ‘আজ সবাই জুটে আসুক’	১৩১২ (১৯০৫)	৫৪	সুর অজ্ঞাত

আমরা যা দেখলাম, কবির এই সময়ের গানগুলিতে লৌকিক সুরের প্রভাব বেশি দেখতে পাওয়া যায়। তার একটি প্রধান কারণ হলো বাংলার প্রচলিত লোকসংগীতের সুর অনেক সহজ-সরল, তার ফলে মানুষের মনের কাছে খুব সহজেই এই গান জায়গা করে

© Santiniketan Sahityapath

নিতে পারে। তাই রবীন্দ্রনাথ এই গানের সুরের ধারা নিজের গানের মধ্যে মিশিয়েছিলেন যাতে খুব সহজেই দেশের মানুষ স্ব-দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়স থেকেই তাঁর পরিবারে এই প্রচলিত সংগীত শুনে বড়ো হয়েছেন। তাই কবির সৃষ্টিতে এই গানের প্রভাব তো থাকবেই। এই প্রসঙ্গে সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার একটি অংশ উল্লেখ করব — "বাংলার লোকসংগীতের কবির ছিল জন্মগত অধিকার। কোলকাতায় থাকাকালীন কিশোর বয়সেই ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত যাত্রা, পাঁচালি, কবিগান, কথকতা, ঢপ কীর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে সম্ভবত বাংলার লোকসংগীতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটা ধারণা কবির মনে সৃষ্টি হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বন্ধু অক্ষয় চৌধুরী সম্পর্কে জানা যায় যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের গানে তাঁর অধিকার ও অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর কাছ থেকেও রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু লৌকিক ও দেশীয় সংগীতের পরিচয় পেয়েছিলেন। এ ছাড়া বালক বয়সেই তাঁর পিতার সঙ্গে নদীপথে ভ্রমণ করার সময় মাঝি-মাল্লাদের গানের মধ্যে দিয়েও পূর্ববঙ্গের লোকসংগীতের সঙ্গে পরিচিতির সুযোগ ঘটে থাকতে পারে। ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্র-অনুজরা কোনো ভিখারি বাউলের বা মাঝিমল্লাদের গান শুনে যে সুর সংগ্রহ করতেন, রবীন্দ্রনাথ সেগুলি তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার করে সংরক্ষণ করতেন। এ বিষয়ে আমরা সরলা দেবী এবং ইন্দিরাদেবীর লেখা থেকে জানতে পারি।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ের স্বদেশি গানে বেশি করে বাউলের সুর ব্যবহার করেছেন, রাগরাগিণীর ব্যবহার হয়েছে কিন্তু তা স্পষ্ট নয়। এই বাউল গান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংগীতের মুক্তি প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন — "একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে, অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণী, ও রাগিণীর আভাস পাই, কিন্তু ধরিতে পারা যায় না। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে, রাগরাগিণীর যতই চোখ রাঙাক সে কিসের কেয়ার করে! এই সুরগুলিকে কোনো রাগকৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না — স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয়।"[১১] এই কারণে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে সব স্বদেশি গান রচনা করেছেন সব গানগুলিতেই প্রায় বাউলের সুরের প্রভাব পড়েছে। বাউল হলো আমাদের দেশের নিজস্ব সুর কোনো বিলিতি সুর নয়। এই আন্দোলনের সময় কবি বিলিতি সবকিছুই যেন বর্জন করে ফেলেছিলেন। এই পর্বের গানগুলি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং জাতীয়তাবাদের জাগরণের জন্য রচিত হয়েছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে রচিত স্বদেশি সংগীত:

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তীকালে রচিত স্বদেশি সংগীতগুলি কাব্য ও সুরের গঠনের দিক থেকে স্বতন্ত্র শ্রেণির। এই পর্বে মোট ১২টি গান কবি রচনা করেছেন। গানগুলি হলো —

গানের তালিকা	রচনাকাল	বয়স
১। 'জনগণমন-অধিনায়ক'	১৩১৮ (১৯১১)	৫০
২। 'দেশ দেশ নন্দিত'	১৩২৪ (১৯১৭)	৫৬
৩। 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে'	১৩১৭ (১৯১০)	৪৯
৪। 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু'	১৩১২ (১৯০৫)	৪৪
৫। 'নাই নাই ভয়'	১৩৩৬ (১৯২৯)	৬৮
৬। 'আমরা সবাই রাজা'	১৩১৭ (১৯১০)	৪৯
৭। 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা'	১৩৩৬ (১৯৩০)	৬৮
৮। 'মাতৃ মন্দির-পুণ্য-অঙ্গন'	১৩২৪ (১৯১৭)	৫৬

© Santiniketan Sahityapath

৯। 'চলো যাই চলো'	১৩৪৩ (১৯৩৭)	৭৫
১০। 'শুভ কর্মপথে ধর'	১৩৪৩ (১৯৩৭)	৭৫
১১। 'ওরে নূতন যুগের ভোরে'	১৩৪৪ (১৯৩৭)	৭৫
১২। 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা'	১৩৪০(১৯৩৩)	৭২

এই গানগুলির মধ্যে 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি খুবই উল্লেখযোগ্য গান। এই গান ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৬ বার্ষিকী অধিবেশনের অনুষ্ঠানে প্রথম গাওয়া হয়। এর পরে আর একটি বিখ্যাত গান নিয়ে আলোচনা করব। ১৯১৫ সালে ভারত রক্ষা আইন পাশ হয়েছিল। এই সময় দেশের তরুণ যুবকদের বিনা বিচারে ইংরেজরা বন্দী করে রাখতে আরম্ভ করল। সেই কারণে শুধু বাংলাদেশ নয় সারা ভারতে তার প্রতীবাদের ঝড় উঠতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ এই সময় তিন মাস হলো সবে আমেরিকা থেকে ফিরেছেন, তিনিও বেঙ্গালি পত্রিকার মাধ্যমে প্রতিবাদ জানালেন। দেশে এইরকম উত্তেজনার মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গো দেখা করতে এলেন। তিনিই কবিকে দেশের নবজাগরণের উদ্দীপনার উদ্দেশ্যে একটি গান লিখতে অনুরোধ করেন। তারপরের দিনই রচিত হলো 'দেশ দেশ নন্দিত করি' এই বিখ্যাত গানটি। উপরিউক্ত সমস্ত গানগুলি যে শুধু তখনকার দিনে স্বদেশিদের উদ্দীপনা দিয়েছে তাই নয় তার পরবর্তী সময়েও কবির রচিত এই গান যথেষ্ট প্রয়োজন মিটিয়েছে একথা এখনো নিঃসন্দেহে বলা চলে। ঊনবিংশ শতকে কবির রচিত স্বদেশি সংগীত দেশবাসীকে যেভাবে ভাবিয়েছিল, মাতিয়েছিল, আজও শতাব্দীর শেষে এই গানের প্রয়োজনীয়তা আমরা সমানভাবে উপলব্ধি করি। রবীন্দ্রনাথের এই গান আগামী দিনেও মানুষকে সমানভাবে উদ্দীপিত করবে।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় প্রদীপ:

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পঞ্চপ্রদীপ হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। বাংলা কাব্যসংগীতের ইতিহাসে একাধারে কবি ও সুরকার আবার অন্যদিকে নাট্যকার হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে লেখা থাকবে। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে বঙ্গাভঙ্গা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত তাঁর স্বদেশি সংগীতগুলি সংগীতের জগতে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম ১৮৬৩ সালে আর মৃত্যু ১৯১৩ সালে। জীবদ্দশার এই সময়সীমার মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংগীত জগৎকে পূর্ণতায় ভরিয়ে তুলেছিলেন। আনুষ্ঠানিক মঞ্চে অভিনয় শিল্পের মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রলাল নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত নাটকগুলি এইভাবে বাংলামঞ্চে অভিনীত হতো। দ্বিজেদ্রলালের নাটকের মাধ্যমে তাঁর রচিত বহু সংগীত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তিনি ইতিহাসের রাজ-রাজাদের অন্তরালে দেশের মানুষের মধ্যে স্বদেশচেতনা সঞ্চারিত করতেন। তাঁর রচিত ঐতিহাসিক চরিত্রে অভিনয় করা কলা-কুশলীদের কণ্ঠে তাঁরই রচিত স্বদেশি সংগীতগুলি পরিবেশিত হতো। এইভাবেই তাঁর নাটকের স্বদেশি গানগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর রচিত যে স্বদেশি সংগীতগুলি নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি হলো —

গানের তালিকা	নাটক	রচনাকাল
১। 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্র'	প্রতাপ সিংহ	১৯০৫
২। 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়'	মেবার পতন	১৯০৮
৩। 'কিসের শোক করিস ভাই'	মেবার পতন	১৯০৮
৪। 'ধনধান্য পুষ্পভরা'	সাহাজাহান	১৯০৯
৫। 'আজি গাও মহা গীত'	চন্দ্রগুপ্ত	১৯১১
৬। 'ঘনতমসাবৃত অম্বর ধরণী'	চন্দ্রগুপ্ত	১৯১১

© Santiniketan Sahityapath

৭। ‘যেদিন সুনীল জলধি হইতে’	সিংহল বিজয়	১৯১৬
৮। ‘ওরে আমার সাধের বীণা’	সিংহল বিজয়	১৯১৬

প্রখ্যাত দেশবরেণ্য বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু ‘মেবার পতন’ নাটকের ‘মেবার পাহাড়’ গানটি কবির মুখে শুনে যে মন্তব্য করেছিলেন তা খুবই উল্লেখযোগ্য — “আপনার এ গানে আমরা কবিত্ব উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু যদি আমি মেবারের লোক হতেম তাহলে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটত।”[১২] পরাধীন ভারতবর্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত দেশাত্মবোধক গান দেশবাসীকে বহুল পরিমাণে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। নাটকের জন্য রচিত দেশাত্মবোধক গান ছাড়াও তাঁর রচিত আরো অনেকগুলি গান যেমন, ‘একবার গালভরা মা ডাকে’, ‘আজি গো মা তোমার চরণে’, ‘তুমি তো সেই মা’ এইসব গানগুলিও অনেক সমাদর লাভ করেছিল দেশবাসীর কাছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রচণ্ড উন্মাদনা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গানে। দেশের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরাই ছিল তাঁর গানের বিষয়বস্তু। এইরকমই একটি গান হলো — ‘এখনো তোমার গগন সুনীল, উজল তপন তারকা চন্দ্রে / এখনো তোমার চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্রে’। এই গানে দেশকে মাতৃরূপে বর্ণনা করেছেন। এই গানের মধ্যে পরাধীন দেশের প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর স্বদেশ সংগীত বাঙালীকে গাম্ভীর্যে, সুরে ও ভাবের মহিমায় এমন মহিমান্বিত করেছিল যে আচার্য জগদীশচন্দ্র দেবকুমার রায়চৌধুরীকে এক পত্রে লিখেছিলেন — “বর্তমান যুগে বীর্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চতর ধর্ম নাই। কে মরণসিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে? ধর্মযুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্রধ্বনিতে ঘোষণা করিয়াছিলেন।”[১৩]

দ্বিজেন্দ্রলালের পাশ্চাত্য সংগীতের প্রতি বিশেষ টান ছিল। তবে, তাঁর রচিত কিছু কিছু সংগীতে পাশ্চাত্য সংগীতের মতো ছন্দের গতি লক্ষ করা যায়। তাঁর রচিত ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানটির কয়েকটি জায়গায় পাশ্চাত্য সংগীতের মতো গতি আছে। আবার কয়েকটি স্বদেশি সংগীতে রাগের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়, যেমন ‘বঙ্গ আমার জননী আমার’ গানটিতে আলাহিয়া বিলাবল রাগে রচিত, ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানটি কেদার রাগে রচিত, ‘ভারত আমার, ভারত আমার’ এই গানটি ইমন-ভূপালীতে রচিত, এবং ‘যেদিন সুনীল জলধি’ গানটিও ইমন-ভূপালীতে সুরারোপিত হয়েছে। কিন্তু সব কয়টি গানে দ্বিজেন্দ্রলালের নিজস্ব মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি রচিত স্বদেশি সংগীতে এত আবেগ, এত ভাবের প্রকাশ যা সমস্ত দেশবাসীর মনে প্রেরণা জাগায় নিজের দেশকে ভালোবাসতে। ব্যঙ্গ সংগীত রচনাতেও দ্বিজেন্দ্রলালের জুড়ি মেলা ভার। তাঁর রচিত একাধিক গানে কৌতুক-শ্লেষের মাধ্যমে স্বদেশি ভাবনার মিল দেখা যায়, যেমন — ‘কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ / গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ’। এই গানটিতে স্বদেশ প্রেমের আড়ালে যেসব মানুষ দেশকেই অপমান করছে, অবমাননা করছে সেই সব মানুষদের প্রতি চরম প্রতিবাদের বাণী লক্ষ করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ চেতনার আরো উদাহরণ আমরা দেখতে পাই তাঁর রচিত ‘আর্যগাথা’ গ্রন্থে — ‘তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে / কখনো বাসনা মাতঃ নাহি চায় চিতে’। এই গ্রন্থের অন্তর্গত ‘আর্যবীণা’ গ্রন্থে প্রায় ৩৮টি স্বদেশি গানের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতি প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার গোস্বামী বলেছেন — “পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচিতি, সেই পরিচিতির প্রকাশ তাঁর স্বদেশী গান, যা বাংলা গানের সীমাকে একসঙ্গে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছে। তাঁর স্বদেশী গান হ'ল কোমলতা ও বলিষ্ঠতার মিশ্রণ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অপূর্ব ধর্ম সমন্বয় ঘটিয়েছে বিভিন্ন সুরের, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল গান রচনা করেছেন সংগঠনের আদর্শে সচেতন শিল্পীরূপে। স্বদেশী আন্দোলনের বিক্ষোভ দ্বিজেন্দ্রলালকে স্পর্শ করেনি, করেছিল বিচলিত। আবার সাময়িকতাও তাঁর গানে রূপ পায়নি।”[১৪]

ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় প্রদীপ:

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাংলার প্রত্যেকটি মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। বাংলার প্রত্যেক ঘরের ঘরে এই আন্দোলনের প্রভাব দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের আর এক কান্ত কবিও এই আন্দোলনের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি। তিনি হলেন আর এক প্রদীপ হলেন রজনীকান্ত সেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে এই কবি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বকবির সংগীতে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব এবং দ্বিজেন্দ্রলালের কৌতুকপুর্ণ সংগীত এই দুই-ই কান্তকবিকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ এই সময়কালের মধ্যে রজনীকান্ত সংগীত জগতে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করে রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের

 © Santiniketan Sahityapath

সঙ্গো রজনীকান্তের দেখা হয় রজনীকান্তের মৃত্যুর দুই বৎসর আগে। রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্তের গান ও কবিতা এই দুইয়েরই খুব অনুরাগী ছিলেন। কবির রচিত স্বদেশি সংগীত খুবই সহজ-সরল সুরে রচিত, খুব সহজেই মানুষের মনে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর রচিত কয়েকটি গান বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল। তিনি দেশকে জননীরূপে দেখেছিলেন। তাই এই গানটি সুরটমল্লার রাগে জননী স্তোত্র নামে পরিচিত — 'নমো নমো নমো জননী বঙ্গা/উত্তরে ঐ অভ্রভেদী, অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য'।

বঙ্গাভঙ্গা আন্দোলনের সময় সবাই বিলিতি জিনিস পরিত্যাগ করে দেশীয় শিল্পের দিকে বেশি করে উৎসাহ প্রকাশ করতে শুরু করল। বিভিন্ন জায়গায় যেমন বোম্বাই, আমেদাবাদ এইসব স্থানে দেশীয় কলগুলিতে মোটা কাপড় তৈরি হতে শুরু হলো। কিন্তু সভ্য সমাজের বাঙালীরা এই মোটা সুতোর কাপড় ঠিকভাবে গ্রহণ করে নিতে পারছিলেন না। ঠিক সেই সময় রজনীকান্ত একটি গান রচনা করে সমস্ত দেশবাসীকে তাদের সংকল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। গানটি হলো — 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নে রে ভাই। / দীন দুঃখিনী মা যে তোদের, তার বেশী আর সাধ্য নাই'। বঙ্গাভঙ্গা আন্দোলনের মুহূর্তে এই গানটি ভারতের আপামোর বাঙালীকে দেশপ্রেমের উৎসাহ প্রদান করেছিল। এরপর দেশের সবাই নিজস্ব মোটা সুতোর কাপড় পরিধান করতে আর দ্বিধা বোধ করেনি। এই গান সম্পর্কে বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছিলেন — "'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' এই উন্মাদক ধ্বনি প্রথম যেদিন আমার কানে প্রবেশ করিল, সেইদিন হইতেই গীত রচয়িতার সঙ্গো পরিচিত হইবার ইচ্ছা মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল।"[১৫] এই গানটি বঙ্গাভঙ্গা আন্দোলনের সঙ্গো জড়িত সমস্ত দেশপ্রেমিকের মনের গান হয়ে উঠেছিল। বাংলার ঘরে ঘরে এবং সমস্ত বাঙালীর কণ্ঠে গানটি ধ্বনিত হতে লাগল। এই প্রসঙ্গো রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছিলেন — "১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে বঙ্গা ব্যবচ্ছেদ ঘোষণার কয়েকদিন পরে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়া কতকগুলি যুবক নগ্নপদে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান গাহিয়া যাইতেছিল। এখনো মনে আছে, গান শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়াছিল।"[১৬] কবির রচিত স্বদেশি সংগীতকে দেশবাসী নিজের প্রাণের সংগীত বলে মনে করতেন। কবি সমাজের মানুষের মধ্যে যে ছোটো-বড়ো ভেদাভেদ, এটা মেনে নিতে পারেন নি। সমস্ত দেশের মানুষ সে ধনী, গরিব যেই হোক সবাই সম্মানের সঙ্গো একসঙ্গো মিলে দেশমাতৃকার সেবা করবে এই ছিল কবির স্বপ্ন। তাই কবি লিখলেন — 'আমরা নেহাৎ গরীব আমরা নেহাৎ ছোট / তবু আজি সাত কোটি ভাই জেগে ওঠো।' রজনীকান্ত তাঁর সমস্ত গানে সহজ লৌকিক সুরের ব্যবহার করেছেন। তাঁর গানে গম্ভীর হিন্দুস্থানী সংগীতের তেমন প্রভাব দেখা যায়নি। তিনি জটিল সুর, কঠিন তাল এইসব বর্জন করেছেন তাঁর রচিত সংগীতগুলিতে। কীর্তন ও বাউলের সুর কবির খুব প্রিয় ছিল, তাই তাঁর গানে এই সুরের প্রভাব বেশী লক্ষ করা যায়। এককথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুজনেরই স্নেহাচ্ছন্নে কান্তকবির সংগীত জীবন পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে।

ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ প্রদীপ:

১৮৭১ সালের ২৬ অক্টোবর অতুলপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্র-সমসাময়িক কালে জন্মগ্রহণ করেও এই কবি সংগীতস্রষ্টা ও সুরকার হিসেবে কাব্যজগতে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। লক্ষ্ণৌ শহরে কর্মজীবন থাকার ফলে কবি টপ্পা, ঠুংরী ও গজল সংগীতের পরিবেশে নিজের সংগীত জীবন গড়ে তুলেছিলেন। তাই কবির রচিত অনেক সংগীতে শাস্ত্রীয় সংগীতের এই ধারাগুলির ছোঁয়া পাওয়া যায়। প্রবাসী হওয়া স্বত্বেও কবির অধিকাংশ গান বাংলা ভাষায় রচিত। দেশের নিজস্ব সংগীত কীর্তন ও বাউলের প্রতিও কবির যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। অতুলপ্রসাদের সমস্ত রচনা 'কয়েকটি গান', 'গীতিগুঞ্জ', ও 'কাকলি' এই তিনটি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। তিনি প্রায় দুশোরো অধিক গান রচনা করেছেন। বস্তুত ১৯০৫-১৯০৬ এই খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর রচিত স্বদেশি সংগীত ভারতের সংগীত জগতে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি যে কয়টি স্বদেশি সংগীত রচনা করেছেন তা সমস্ত দেশবাসীকে দেশপ্রেমের উন্মাদনায় মাতিয়ে তুলেছিল। অতুলপ্রসাদ সেন হলেন ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ প্রদীপ যিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্তের মতো সংগীত স্বাদেশিকতায় দেশবাসীকে উৎসাহিত করেছিলেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গাভঙ্গা আন্দোলনের জোয়ারে তিনিও সংগীতের মাধ্যমে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন।

ইংরেজ শাসনের অত্যাচারে নিপীড়িত মৃতপ্রায় ভারতবাসীকে প্রাণের স্পন্দন এনে দিয়েছিলেন এই কবি তাঁর সংগীত রচনার মধ্য দিয়ে। কবি মোট ১৩টি স্বদেশি সংগীত রচনা করেছেন। কবির রচিত প্রথম স্বদেশি গান হলো — 'উঠ গো ভারত লক্ষী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা, / দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত-লজ্জা'। কবির রচিত আর একটি বিখ্যাত স্বদেশি সংগীত হলো — 'মোদের গরব মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা / তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালোবাসা'। এই দুটি স্বদেশি গান

© Santiniketan Sahityapath

খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এই দুটি গান সম্পর্কে অরুণকুমার বসু একটি প্রবন্ধে লিখেছেন — "'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী', 'মোদের গরব মোদের আশা' সংগীত-দ্বয়ের সঙ্গো বাঙালী মাত্রেরই শৈশব যৌবনের ঘ্রাণ জড়িত। মাতৃভূমি মাতৃভাষার প্রতি এমন শোনিতকম্প্র আবেগ অশ্রু কবোষ্ণ আসক্তি উদাস ধুলিশয়ান প্রণতি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ দেশ-গৌরবী গানের সঙ্গোই তুলনীয়।"[১৭] বিদেশি সুরে 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' গানটি তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি স্বদেশি গান হলো — 'বলো বলো বলো সবে', 'হও ধরমেতে ধীর', মোরে কে ডাকে আয় রে', 'দেখ মা এবার দুয়ার খুলে', 'কতকাল রবে নিজ-যশ-বিভব অন্বেষণ', 'কঠিন শাসনে করো মা, শাসিত', 'জাগো জাগো — জাগো এবে', 'ভারত-ভানু কোথা লুকালে,' 'খাঁচার গান গাইব না আর', 'নুতন বরষ, নূতন বরষ' ও 'পরের শিকল ভাঙ্গিস পরে'। কবির রচিত প্রায় সবকয়টি স্বদেশি সংগীত দেশমাতৃকার বন্দনায় এবং সহজ, সুন্দর সুরে ভক্তিভাবের মধ্যে রচিত হয়েছে তাই সংগীতগুলি মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। অতুলপ্রসাদ রচিত 'হও ধরমেতে ধীর' গানটিতে জাতীয় আদর্শের ভাবধারা লক্ষ করা যায়। রামপ্রসাদী সুরে রচিত 'দেখ্ মা এবার দুয়ার খুলে' এই এই গানটিতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। কবি দেশবাসীকে মানবসেবা ধর্মে ব্রতী হতে রচনা করলেন — 'কতকাল রবে নিজ-যশ-বিভব অন্বেষণে'। বাংলা দেশাত্মবোধক সংগীত জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন একজন অসম্ভব প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্ব ঠিক সেইরকম তাঁর সমকালীন কবিরাও সেইরকম পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়ে সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করে রেখে দিয়ে গেছেন। ঊনবিংশ শতকে অতুলপ্রসাদ রচিত স্বদেশি সংগীত ভারতে নবজাগরণ এনেছিল। তাই কবিকে 'ভারত জাগরণের কবি' বললে তা দোষের মধ্যে পড়ে না। পঞ্চপ্রদীপের এই চতুর্থ প্রদীপ তাঁর স্বদেশি সংগীততের মাধ্যমে ভারতকে পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করতে অনেক সাহায্য করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের পঞ্চম প্রদীপ:

বাংলাদেশের একজন খুবই জনপ্রিয় কবি ও গীতিকার হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৮৯৯-১৯৭৬ এই সময় কালের মধ্যে এই কবির কাব্যপ্রতিভা সত্যিই রোমাঞ্চকর। নজরুল ইসলাম এমন এক সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন ইংরেজদের শাসনে অতিষ্ঠ ভারতবাসী স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সারা ভারতবাসী বিভিন্ন রকমের যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছিল। সারা ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সমাজে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে এক নতুন উদ্দীপনার ঝড় উঠল। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য রচনা সেই জাগরণের ঝড়ে সামিল হয়ে দেশের মানুষের মনে এক বৈপ্লবিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ প্রদীপ হলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের স্বদেশি সংগীতগুলিতে মানবতাবাদ ও দেশাত্মবোধের সার্থক মিলন সম্ভব হয়েছে। তাঁর স্বদেশি সংগীতগুলিতে সমাজের লাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত মানুষদের সঙ্গো অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ভাষা দেখতে পাওয়া যায়। কবি যেন এইসবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে। সংগীতকেই কবি সেই বিদ্রোহের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ইংরেজদের শাসনে অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষ, শাসনের সমস্ত বেড়াজাল ভেঙ্গো উদ্দাম বেগে ছুটে চলছে স্বাধীনতার জন্য ন্যায়ের পতাকা হাতে নিয়ে। নজরুল দেশের সর্বহারা জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে জাতীয় জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন উদাত্ত কণ্ঠে। কবি যৌবন কাল থেকেই দেশের গণআন্দোলনে প্রত্যক্ষ্যভাবে অংশগ্রহন করেছিলেন। ১৯১৭ সালে এই বিদ্রোহী কবি সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন এইখান থেকেই দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রতি প্রবল আকাঙ্খা কবিকে প্রভাবিত করেছিল। স্বদেশের প্রতি কবির এই ভাবনারই প্রকাশ ঘটে তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি কর্মে। স্বদেশকে নিয়ে লেখা এইরকম কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হলো, ১৯২২ সালে রচিত 'অগ্নিবীণা', ১৯২৪ সালে রচিত 'বিষের বাঁশি', ১৯২৪ সালে আর একটি কাব্যগ্রন্থ 'ভাঙ্গার গান', ১৯২৫ সালে রচিত 'সাম্যবাদী', ১৯২৬ সালে রচিত 'সর্বহারা', ১৯২৭ সালে রচিত 'ফণিমনসা', এবং ১৯৩০ সালে রচিত 'প্রলয়শিখা'।

নজরুলের স্বদেশি গান মূলত সংগ্রামী মানুষের সুখ ও দুঃখের গান। তাঁর গান একদিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে আবার অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসানের প্রচেষ্টা করেছে। কবি ছাত্রদের দেশপ্রেমে আহ্বান করে অনেক গান রচনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গান হলো — 'চল্ চল্ চল্, ঊর্ধগগনে বাজে মাদল / নিম্নে উতলা ধরনীতল / অরুণপ্রাতের তরুণদল চল্ রে চল্ রে চল্'। কবি তাঁর স্বদেশি গানে জ্বালাময়ী ভাষার প্রয়োগ করেছেন। সেইরকমই একটি গান হলো — 'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গো ফেল কররে লোপাট / রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী।' এই গানটির ভাষাই মানুষের মনের

© Santiniketan Sahityapath

মধ্যে বিদ্রোহের ঘোষণা করছে। ইংরেজদের শাসনের বেড়াজালে অতিষ্ঠ মন-প্রাণ শাসনের গন্ডি ভেঙ্গো বেরিয়ে আসতে চাইছে। এই গানটির শেষ স্তবক সেইরকমই ভাবনার প্রকাশ করে — 'লাথি মার ভাঙ্গারে তালা, / যত সব বন্দী শালায় / আগুন-জ্বালা, আগুন-জ্বালা, / ফেল উপাড়ি'। গানের মাধ্যমে এইরকম জ্বালামুখী প্রতি আবেদন স্বদেশিদের মনে উত্তেজনা তো সৃষ্টি করবেই। এইরকম আর একটি বিক্ষোভের গান হলো — 'এই শিকল পরা ছল, মোদের এ শিকল পরা ছল / এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল।'

নজরুলের রচিত এই সব স্বদেশি গান জাতীর জনজীবনে যে চঞ্চলতা জাগিয়েছিল, সেই একই চঞ্চলতা বা তার রেশ এখনো আমরা অনুভব করি, যখনি এই গানগুলি আমরা শ্রবণ করি। কবির এই জ্বালাময়ী রচনার জন্য কবিকে বন্দী করা হয়েছিল, সেখানেও কবি নিজেকে থামিয়ে রাখেন নি। জেলে বসে কবি অনশন করেছিলেন এবং সেই সময় কবি যে গানটি রচনা করেছিলেন সেটি হলো, 'জাগো অনশন বন্দী ওঠোরে যত।' এই সাম্যবাদী ভাবাশ্রিত গান কবির রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি গাঁথা। এছাড়া নজরুল রচিত 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে' গানটিতে রূপকের সার্থক ব্যবহারে স্বদেশ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। এই গানটির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের জন্য কবি ডাক দিয়েছেন। কবির রচিত স্বদেশি গানে যেমন হিন্দুস্থানী রাগের আভাস পাওয়া যায় আবার লোকায়ত বাউল সুরেরও প্রভাব দেখা যায়। কবি তাঁর রচিত কয়েকটি স্বদেশি গানকে শুদ্ধ রাগেও রচনা করার চেষ্ঠা করেছেন, যেমন 'গঙ্গা-সিন্ধু-নর্মদা, কাবেরী যমুনা ওই।' এই গানটি দাদরা তালে নিবন্ধ। আবার 'হে পার্থসারথী বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ।' এই গানটি ত্রিতালে এবং শিবরঞ্জনী রাগে নিবন্ধ। কিন্তু বিশুদ্ধ রাগে আশ্রিত স্বদেশি গানের সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। নজরুল সংগ্রামী কবি ছিলেন, তিনি বরাবর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, জাতের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। এইরকমই একটি গান হলো, 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া / ছুঁলেই তোরে জাত যাবে, জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া'।

নজরুল স্বাধীনতা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ স্রষ্টা ছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তি কামনা তাঁর মনের সঙ্গো মিশে ছিল। সর্বকালের, সর্বজনের মনের গান হলো নজরুলের স্বদেশি গান। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গো নজরুলের একই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের গান জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছিল। নজরুলের সংগীতগুলিও কোনো দেশ-কাল-জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সব জাতির কাছে সমানভাবে সমাদর পেয়েছে। সেই হিন্দুমেলার সময় থেকে এই স্বদেশি সংগীতগুলি সংস্কৃতি আন্দোলনের মাধ্যম হিসেবে স্থান পেয়ে এসেছে। বাঙালির চিন্তায় ভাবনায় মননে সংগীতের মাধ্যমে যে স্বাদেশিকতা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল ঊনবিংশ শতকের শেষ পঞ্চপ্রদীপ কাজী নজরুল ইসলাম হলেন তার সর্বশেষ কণ্ঠস্বর, এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

পরিশেষে এই কথা বলতে পারি যে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতবর্ষে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে, তা জোরালো হয়েছে সংগীতের মাধ্যমে। সংগীতের ভাষা হলো সার্বজনীন ভাষা। তাই সেই ভাষাতে যখন প্রতিবাদের সুর তোলা হয় তার শব্দ অত্যন্ত জোরালো হয়। পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করতে সংগীতের ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। অনেক কবি, সাহিত্যিক এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তাঁদের কাব্য প্রতিভা দিয়ে, কিন্তু ঊনবিংশ শতকের পঞ্চপ্রদীপের জুড়ি মেলা ভার। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ এবং নজরুলের স্বদেশি গানের অনুপ্রেরণায় ভারতের স্বাদেশিকতায় প্রাণের জোয়ার ডেকে এনেছিল। এই পাঁচজন কবি সমসাময়িক কালে জন্মগ্রহন করেও তাঁরা তাঁদের প্রতিভাগুণে সংগীত ও সাহিত্যের জগতে স্বতন্ত্র ভূমিকায় বিরাজ করছেন।

তথ্যসূত্র:

১। 'বাংলার নবযুগ', মোহিতলাল মজুমদার, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ, ১৩৫২, পৃ. ১
২। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' ৯ম খণ্ড, স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৪, পৃ. ৪৭২
৩। 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৩, পৃ. ৪৩৫
৪। ওই, ৫ম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৩, পৃ. ১১৬
৫। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৭১', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রকাশক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কার্তিক ১৩৫৫, পৃ. ৫২-৫৩

© Santiniketan Sahityapath

৬। 'ভারতীয় সংগীতের কথা', প্রভাতকুমার গোস্বামী, আদি নাথ ব্রাদার্স, জানুআরি, ২০১১, পৃ. ২৪৪
৭। ওই, পৃ. ২৪৫
৮। 'জীবনস্মৃতি', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২০১৭ (শক ১৯৩৯), পৃ. ৮৫
৯। 'রবীন্দ্রসংগীত: কাব্য ও সুর', কণিকা বন্দোপাধ্যায় / বীরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, জুলাই ১৯৯৬, পৃ. ১০৪-১০৫
১০। 'রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানে স্বদেশ পর্যায়: কিছু আলোচনা', সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতবিতান, ২০ মার্চ ২০০০, পৃ. ৯০
১১। 'সংগীতচিন্তা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পনর্মুর্দ্রণ; জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, চৈত্র ১৪২১, পৃ. ৫৫
১২। 'সংগীত-তত্ত্ব, রবীন্দ্র প্রসঙ্গ', দেবব্রত দত্ত, ব্রতী প্রকাশনী, পৃ. ২১৯-২২০
১৩। 'দ্বিজেন্দ্রলাল', দেবকুমার রায়চৌধুরী, কুন্তলীন প্রেস পৃ. ৩৯৬
১৪। 'ভারতীয় সংগীতের কথা', প্রভাতকুমার গোস্বামী, আদি নাথ ব্রাদার্স, জুন ২০০৫, পৃ. ২৪৯
১৫। 'কান্তকবি রজনীকান্ত', নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, প্রতিভাস পাবলিশার্স, ১৩৭২, পৃ. ৫৩
১৬। ওই, পৃ. ৫১
১৭। 'প্রবন্ধ-কবি অতুলপ্রসাদ সেন', অরুণকুমার বসু, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, পৃ. ৩১৫

—

Prantik Gabeshana Patrika

 © Santiniketan Sahityapath